ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও জনকল্যাণঃ কেন্দ্রীয়তার ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত

লুইস টিলিন

৩ জানুয়ারী, ২০২২

ভারতের ঔপনিবেশিক অবস্থার পরবর্তী সময়ের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিষয়ে একটি নতুন পন্থা নেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি হ্রস্বতর রূপ বা "অনুকৃতি" হিসাবে সেই সময়ে এবং তার পরেও এই পন্থাটি যথাযথ ছিল বলে ধরে নেওয়া হত। এর কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আঞ্চলিক শাসন ব্যবস্থা পরস্পরের থেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের কর্তৃত্বের বলয় অধিকার করে থাকবে – এই প্রচলিত ধারণা থেকে এই নতুন পদক্ষেপটি সরে আসে এবং রাষ্ট্রের হাতে রাজ্যের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করার বিশেষ ক্ষমতা তুলে দেয়। ১৯৮৯-২০১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রাজনৈতিক আঞ্চলিকীকরণের যে পর্ব চলে, সেই সময় ভারতের গতিপথ অনিবার্যভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আরও গভীরে চলে যাচ্ছিল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সম্পূর্ণ সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি সরকার ভারতের সংবিধানের কেন্দ্রীকরণের পরিপূর্ণ সম্ভাবনাকে আবারও সামনে তুলে এনেছে।

এই প্রবন্ধে আমি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বতন্ত্রতাপূর্ণ রূপের ঐতিহাসিক পূর্ববৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করব। সম্প্রতি মাধব খোসলা যেমন বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সাংবিধানিক উদ্ভাবনের ব্যতিক্রমী রাস্তায় এগোতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীতে এর তাৎপর্য ছিল "দৃষ্টান্তমূলক"। এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার যে ভারতীয় আদর্শটির পরিকল্পনা করা হয় সেটিও কম দৃষ্টান্তমূলক ছিল না। ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে ফিরে গেলে বোঝা যাবে যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আদতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পূর্ববর্তী রূপের একটি অনুকৃতি মাত্র নয়। বরং, তা হল ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পরই ভারত যে সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়েছিল সেগুলির মোকাবিলাতে প্রস্তুত একটি নতুন ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

দেশভাগ পরবর্তী সময়ে দেশকে ধরে রাখার জন্য সংবিধান সভার যে চিন্তা ছিল তার থেকেই ভারতের কেন্দ্রীয়তা উঠে এসেছে বলে অনেক সময়ই দাবি করা হয়। খোসলা এর সঙ্গে আরও যোগ করেন, স্থানীয় আধিপত্যের ধাঁচা থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল এবং সেই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীকরণের এই প্রবণতা দেশের গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হয়ে ওঠে। ভারতের রাজ্য ও জনকল্যাণ এবং ইতিহাস সংক্রান্ত একটি বই-এর জন্য আমার যে গবেষণা তার পাশাপাশি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার বিষয়ে অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী কাজগুলির উপর ভিত্তি করে আমি এই দেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির উপাদানগুলিকেও বিশ্লেষণ করব। এই উপাদানগুলিও ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় নকশাকে প্রভাবিত করেছে। আমি বিশেষ করে প্রস্তাব করতে চাই যে, ভারতের পুঁজি, শ্রমিক নেতা এবং জাতিয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের একটা অংশের আকাঙ্খা ছিল আন্তঃ-প্রাদেশিক অর্থনীতিকেন্দ্রিক প্রতিযোগিতার কারণে সর্বভারতীয় স্তরে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্যা তৈরি হয় তাকে অতিক্রম করে একটি জাতীয় অর্থনীতি নির্মাণ করার। এই আকাঙ্খাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বতন্ত্র উপাদানগুলির জন্মলগ্নে সেগুলিকে আকার দিয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে, যা কিনা পাটশিল্পের পাশাপাশি ভারতের সর্ববৃহৎ শিল্প, শ্রমের মূল্য ও অবস্থা নিয়ে "নিচের দিকে যাওয়ার দৌড়ে" আন্তঃ-প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্পের সবচেয়ে পুরনো কেন্দ্র বম্বে সিটিতে এই শিল্পকেন্দ্রিক কাজে ক্রমশ লোকসান বাড়তে শুরু করে এবং বেতন কমানো, ছাঁটাই ও "কাজকর্মের দক্ষতা বাড়াতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন" বা "র‍্যাশানালাইজেশান"-এর প্রতিবাদে এখানকার কলকারখানাগুলিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। এই ক্রমশ খারাপ হতে থাকা শিল্প সম্পর্কের উত্তরে কিছু মালিক স্থানীয় ব্যক্তি, কয়েকজন শ্রমিক নেতা (তাঁদের মধ্যে বি. আর. আম্বেদকর একজন) ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের একটা অংশ, ভিন্ন ভিন্ন

ভাবে, একটি কেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের কথা বলতে শুরু করেন। এই রাষ্ট্রের কর্মপন্থা হত, শ্রম নীতি ও সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলের মালিকশ্রেণীর উপর বিশাল খরচের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার বদলে সর্বভারতীয় স্তরে এই সুরক্ষার প্রয়োগ। নিম্ন বেতন দেয় এমন অঞ্চলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে বম্বের মত স্বতন্ত্র প্রদেশে, বিভিন্ন নীতি নিয়ে গবেষণার পরিসর ক্রমশ কমে যাচ্ছিল। উদাহরণ হিসাবে, নতুন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ বা ইন্টারন্যাশানাল লেবার অরগানাইজেশান থেকে উঠে আসা অবদানভিত্তিক সামাজিক বিমা যা স্থানীয় মালিকদের উপর অতিরিক্ত খরচের দায়িত্ব তুলে দেয় এমন নীতির কথা উল্লেখ করা যায়।

সংরক্ষিত গবেষণার উপর নির্ভর করে আমি যেমন দেখাচ্ছি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টস ১৯১৯ ও ১৯৩৫ – দুটি আইনকেই, যথাক্রমে ইন্টারন্যাশানাল লেবার অরগানাইজেশান আর ব্রিটিশ লেবার পার্টির (ভারতের ন্যাশানাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশানের মতামতকে সামনে এনে) চাপের মুখে পড়ে সংশোধন করা হয়, যাতে পরবর্তীকালে যা সংবিধানের আনুষঙ্গিক সূচীতে পরিণত হয়, সেই তালিকায় একে যোগ করে শ্রম নীতিকে জাতীয় স্তরে সমন্বিত করার সুযোগ নিশ্চিত করা যায়। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যাঁরা জাতীয় শিল্প ও শ্রম আইনকে সব সময়ই এড়িয়ে যেতে চাইতেন তাঁরা এই ঘটনাটির ফলে যথেষ্ট হতাশ হন। এই আইনগুলির বিষয়ে কোন রকম হস্তক্ষেপ করার বদলে, তাঁরা বরং উদাসীন থাকারই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৪০-এর দশকের শুরুর দিকে এই সাংবিধানিক বন্দোবস্তগুলির সহযোগী হিসাবে জাতীয় শ্রম সম্মেলন বা ন্যাশানাল লেবার কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা হয়। শিল্প সম্পর্ক ও শ্রম নীতি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার জন্য পরবর্তীকালে মালিকপক্ষ, শ্রমিক ও রাষ্ট্রকে নিয়ে যে স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় কমিটি তৈরি হয়, এই সম্মেলনগুলি ছিল তারই অগ্রদূত।

সংবিধান সভা একটি খসড়া সংবিধান তৈরির সময় ক্ষমতার বিভাজনের জন্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫-কে সামনে রাখে। এর মানেই ওই খসড়া একটি ঔপনিবেশিক সাংবিধানিক প্রতিলিপিকে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে তৈরি বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি হ্রস্বতর সংস্করণ মাত্র এমন নয়। ভারতের সংবিধান নির্মাতারা ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এমন একটি পাঠান্তরকে পরিগ্রহণ করেন যা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপযুক্ত ছিল। ইউএস ও কানাডার মত বিকেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে আরও ব্যাপক রাষ্ট্রপরিচালিত জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য দাবি বেড়ে যাচ্ছি কিন্তু আন্তঃ-রাজ্য প্রতিযোগিতার ফলে বেকারভাতা ও পেনশন বিষয়ক যে নীতির প্রয়োগ করলে একটি অঞ্চলের খরচ বাড়বে, অন্যগুলির নয়, সেগুলি গ্রহণে বাধা তৈরি হচ্ছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রগুলি একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল, একটি কেন্দ্রীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বেছে নিয়ে ভারত সে রকম অবস্থাকে আগে থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কেন্দ্রীকতার ইতিবৃত্ত শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়ই নয়। সেগুলি আজও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এখনও সেগুলির প্রেক্ষিতেই জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও নীতি নির্ণায়ক কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। আশ্চর্যজনকভাবেই সম্ভবত, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার কোন ভাবে কেন্দ্রীয়তার কল্পনাকে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং একে নানা নীতির মধ্যে সর্বভারতীয় স্তরে সমন্বয় সাধনে সক্ষম একটি শক্তি বলে প্রতিষ্ঠা করছে। শ্রম আইনের জাতীয় স্তরে সংশোধনের পথে বহু দশক ধরেই যে সমস্ত বাধা ছিল সেগুলিকে অতিক্রম করার উপায় হিসাবে, ক্ষুদ্র কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় সংগঠিত কর্মক্ষেত্রকে পরিচালনা করে যে কেন্দ্রীয় শ্রম আইন সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও সংশোধন করার জন্য মোদী সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে উৎসাহিত করছে। তবে এর সঙ্গে সঙ্গেই, এত দিন ধরে অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের জন্য যে জনকল্যাণ ও প্রত্যক্ষ সুবিধা পরিকল্পনা বা ডিরেক্ট বেনিফিট স্কিমের আকারদান ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে এসেছে, কেন্দ্র সরকার সেগুলির নকশা ও আমানতের দাবিকে কেন্দ্রীভূত করেছে। এই যুগ্ম পন্থার কারণে শ্রমিকদের অবস্থার ক্ষেত্রে একটি "নিচের দিকে যাওয়ার দৌড়" আটকানোর নিয়ন্ত্রক হিসাবে কেন্দ্রের ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং তার পাশাপাশি, অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রের জন্য যে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি পরিচালিত হয় সেগুলির বন্টন প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির (বিশেষ করে যে সব রাজ্যের শাসনক্ষমতা বিরোধী দলের হাতে) সমন্বয় সাধনের উৎসাহ ও ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু, এই জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের

ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে জটিলতার ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায়, কেন ভারতীয় সংবিধানের নির্মাতারা ঠিক করেছিলেন যে, জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম রাজ্য বা রাষ্ট্র কারোরই একার অধিকারে থাকবে না।

লুইস টিলিন কিং'স ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও ডিরেক্টর।